সপ্তম অধ্যায়

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বাক্য গঠনরীতিগত বৈচিত্র্য

সপ্তম অধ্যায়

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বাক্য গঠনরীতিগত বৈচিত্র্য

সাহিত্যের গঠনশিল্পের মূল আশ্রয় ভাষাভাবনা। কাহিনী-কল্প-চরিত্রায়ন-পরিবেশের সমবায়ে উপন্যাস সাহিত্যের যে সৃজন পদ্ধতি—সমস্ত কিছুরই উৎস ভাষাশিল্প। ভাষাকে শুধু উপন্যাসের বহিরঙ্গ অবয়ব বলে ভাবলে ভুল হবে বরং এর অন্তরঙ্গ দ্যোতনায় মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। উপন্যাসের আকর্ষক চুম্বক শক্তি যে ভাষা সেটি নিঃসংশয়েই বলা চলে।

এই ভাষা-পটভূমিকে বিশ্লেষণ করলে 'বাক্য প্রসঙ্গ' গুরুত্ব পায়। 'ভাষা'কে আমরা এভাবেই বিশ্লেষিত করতে পারি যে এটি আমাদের মুখ নির্গত একজাতীয় অর্থপূর্ণ ধ্বনি প্রবাহ যা বাক্যের আকারে প্রকাশিত হয়। বাক্য কতগুলি বিশেষ উপাদানের পরম্পরাপূর্ণ বিন্যস্ত গঠন যেটি বিশেষ ভাষার নিজস্ব ছাঁদ রূপ পরিবর্তনের নিয়মে মিলিত যেন একটি একক বিশেষ। বাক্যই ভাষার আত্মাস্বরূপ।

শিল্পী বাক্যের এই নিতান্ত ব্যাকরণ নির্দিষ্ট সংজ্ঞাকে নিজ উপলব্ধি জাত অনুভবে রসাবেদনে পরিণত করেন। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'—বাক্যের রসে পরিণত হওয়ার মধ্য দিয়ে শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রবণতা উদ্ঘাটিত হয়। বাক্য রচনার বিশেষত্বময় অভিনবত্বে শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রবণতাটি উন্মোচিত হয়। যা কখনও দেখা যায় শব্দের স্থান পরিবর্তনে, ক্রিয়াপদ ব্যবহারের বৈচিত্র্যে সম্বোধনে, প্রশ্ন-বিস্ময়বোধক উক্তিতে, অর্থ-যতি নির্ণয়ের দক্ষতায়—সমস্তটা মিলিয়ে বাক্যগঠনের বিশেষ প্রকাশধর্মে। কথাশিল্পীর রচনা প্রকরণের ভালো-মন্দ অনেকটাই নির্ধারণ করে বাক্যগঠন পদ্ধতি। প্রাবন্ধিক অবন্তীকুমার সান্যাল এপ্রসঙ্গটিকে এভাবেই আলোচনা করেছেন— *'সাধারণভাবে*

ভাল লেখককে লোকে চেনে রচিত বাক্যগুলির গতি এবং স্টাইলের ভঙ্গিটি দেখেই।'[১] এ-প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে বাক্যের তাল-রং-গতি ও ধ্বনির সার্থক উপাস্থাপনার মধ্য দিয়ে শিল্পীর বক্তব্যবিষয় মূর্তরূপ ধরে। বাক্যের আলোচনা তাই ভাষা-আলোচনার মুখ্য বিষয়। যেহেতু একাধিক বাক্যের বিন্যাসে অনুচ্ছেদের সৃষ্টি এবং এই অনুচ্ছেদই গড়ে পরিচ্ছেদ, আবার পরিচ্ছেদের সমবায়ে অধ্যায় গড়ে ওঠে—শিল্পীর বক্তব্যবিষয় বাক্যের সরণী বেয়ে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় এভাবেই বিস্তৃত ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে।

পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যভাবনায় বাক্যগঠনের মৌলিকতা গুণ ছিল সুপ্রচুর। তাঁর ভাষা যেহেতু ভাবের উপযোগী ছিল এবং সেটি যে কখনও ভাবকে ছাড়িয়ে স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি—এই বিশেষ গুণটি বাক্যগঠনের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ করলেই বোঝা যায়। মূলত বিদ্যাসাগরীয় রীতিতে বাক্যে তৎসম শব্দের প্রয়োগ; সমাসের আড়ম্বর, সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী বাক্যের ছাঁদে তিনি তুলে ধরলেন। এ ভাষারীতি গদ্যভঙ্গিতে নমনীয়তা ও সরসতা সঞ্চার করেছিল। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাক্যগঠন করেছেন এ ভাবে—'*তখন নিশাকর হেলিতে দুলিতে গজেন্দ্র গমনে চিত্রাতীর শোভী সোপানাবলীর উপর গিয়া বসিলেন। অন্ধকারে নক্ষত্রচ্ছায়া প্রদীপ্ত চিত্রাবারি নীরবে চলিতেছে। চারিদিকে শৃগাল কুক্করাদি বহুবিধ রব করিতেছে।*'[২] তৎসম সমাসবদ্ধ পদে গঠিত বাক্যগুলির সমতা ভাষায় ধ্রুপদীভঙ্গি এনেছে। চলিতেছে, করিতেছে ইত্যাদি সমাপিকা ক্রিয়াপদগুলির ব্যবহার গদ্যভাষায় সম্পূর্ণতা এনেছে। গদ্যভাষা চিত্রধর্মী হয়ে উঠেছে। সমালোচক রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বাক্যগঠন প্রক্রিয়া তথা গদ্যভাবনাকে আলোচনা করেছেন এভাবে—'*বঙ্গদর্শনের পূর্বেকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যাবে, এক প্রান্তে একটা বড় মনের নাড়া খেলে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে যায় কত দ্রুত বেগে আর তখনি তখনি তার ভাষা কেমন করে নূতন নূতন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে নিয়ে চলে।*'[৩] বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাভাবনা আলোচনায় তাঁর বাক্যভাবনা পূর্বতনরীতিকে স্বীকার করে নিয়ে মৌলিকত্বে ক্রমেই যে উদ্ভাসিত হয়েছে সেটি তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসগুলি পাঠ করলেই পাঠক অনুভব করেন।

পরবর্তী ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যভাবনায় সাবলীলতা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর সৃষ্ট কথাসাহিত্যের বাক্যভাবনায় সেই সাবলীলতা অতি সহজেই অনুভব করা যায়। পর্যবেক্ষণ শক্তি

মধ্যমপুরুষের ক্রিয়াপদ 'চাহিয়া দেখ' ইত্যাদি প্রয়োগে বাক্য অন্তরঙ্গতা পেয়েছে। উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ 'দেখিয়াছিলাম' লেখকের স্বকণ্ঠে ঘোষিত হয়ে ভাষায় আবেগঘন নাটকীয়তা এনেছে।

'দেবদাস' উপন্যাসে শেষাংশে দেবদাসের করুণ জীবনের অপূর্ণ কাহিনির মর্মস্পর্শী বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক একাত্ম হয়ে পাঠকের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখেছেন—*'এখন এতদিনে পার্বতীর কি হইয়াছে, কেমন আছে জানিনা। সংবাদ লইতেও ইচ্ছা করেনা। শুধু দেবদাসের জন্য বড় কষ্ট হয়। তোমরা যে-কেহ এ কাহিনি পড়িবে, হয়ত আমাদেরই মত দুঃখ পাইবে। তবু যদি কখনও দেবদাসের মত এমন হতভাগ্য অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও।'*[১২]—অদৃশ্য পাঠকের উদ্দেশ্যে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদে লেখকের নিজ মন্তব্য বাক্য গঠন প্রক্রিয়ায় যে বৈচিত্র্য এনেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভাষাকল্পনা হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে যেন উৎসারিত হয়েছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বে নিষ্ঠুর অমানবিক নতুনদার ভবিষ্যৎ জীবনে ডেপুটি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রসঙ্গে শ্রীকান্তের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের স্বকণ্ঠ প্রকাশিত হয়—*'যাই হোক এতদিন পরে, এখন তিনি কোথাকার ডেপুটি কিংবা আদৌ সে কাজ পাইয়াছেন কিনা, সে সংবাদ জানিনা, কিন্তু মনে হয় যেন পাইয়াছেন, না হইলে বাঙালী ডেপুটির মাঝে মাঝে এত সুখ্যাতি শুনিতে পাই কি করিয়া?'*[১৩] —জটিল ও যৌগিক বাক্যবন্ধে গঠিত মিশ্র বাক্যের বিবৃতিতে সহজ সাধুগদ্যে সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের স্বার্থপরতা ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে। অসমাপিকা ক্রিয়াপদের ব্যবহার বাক্যের সমাপ্তিতে প্রযুক্ত হয়ে সাধু ভাষাকে সচলতা দিয়েছে। শ্রীকান্তের কণ্ঠে শরৎচন্দ্র উপস্থিতি হয়েছেন যেন ভাষায়। এ বাক্যবন্ধনে লেখকের সঙ্গে পাঠকের আলাপচারিতা অনুরণিত।

উপন্যাসের পাশাপাশি কিছু গল্পেও লেখকের এ-জাতীয় উপস্থিতি ভাষায় অনুভূত হয়। অভাগীর স্বর্গ গল্পটিতে সদ্য মাতৃহীন কাঙালী গোমস্তা অধর রায়ের কাছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করতে গেল। কিন্তু কাজ কিছুই হল না, সেকথা বলার আগেই লেখক স্বয়ং জমিদারী পরিচালনার দুর্নীতি সম্পর্কে ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেছেন বাক্যে—*'হায়রে অনভিজ্ঞ! বাংলাদেশের জমিদার ও তাহার কর্মচারীকে সে চিনিত না।'*[১৪]—সরল বাক্যে 'হায়রে' অব্যয় ও বিস্ময়সূচক চিহ্নের ব্যবহারে ভাষা আবেগ ঘন হয়ে উঠেছে। নির্যাতিত মানুষের প্রতি সমবেদনায় শিল্পী অধীর হয়ে উঠেছেন। বাক্য হৃদয়ের অন্তরঙ্গতার আবেশে একাত্ম হয়েছে। 'বিলাসী' গল্পে শরৎচন্দ্রের

আত্মপ্রকাশ লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে —*'আমি ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধেরও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথা সামাজিক বিধি ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও মুখের উপর কড়া জবাব দিয়া যাহারা বলিবেন, এই হিন্দু সমাজ তাহার নির্ভুল বিধি-ব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অতগুলা বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়, এবং অতিশয় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে'*[১৫]—প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অন্যায় ও বিবেকহীন দিকটি মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীর অপরিণত প্রণয়কাহিনির করুণ সমাপ্তিতে সমাজ সচেতন কথাসাহিত্যেকের কণ্ঠে উত্তম পুরুষের বয়ানে 'আমি' সর্বনামের প্রতিষ্ঠায় উৎসারিত হয়েছে। বাক্যের শুরুতে 'করিলেও' অসমাপিকা ক্রিয়াপদের ব্যবহার ভাষা ভাবনায় দৃঢ়তা এনেছে। ভাষা যেন পাঠেকর উদ্দেশ্যে অগ্নিস্রাবী লাভার মতই বর্ষিত হয়েছে। দীর্ঘ বাক্য সেই আবহ নির্মাণে সহায়ক হয়েছে।

বাক্যগঠনের যে দুটি প্রকরণ সাধু ও চলিতে উৎসারিত বিশেষত গদ্যশিল্প আলোচনায় যেটি মুখ্য ভূমিকা নেয়—শরৎচন্দ্রের গদ্য তথা বাক্যশিল্প সেই দুটি ধারাতেই স্বচ্ছন্দ ছিল। তাঁর সাধু বাক্যগঠনের কৃতিত্ব ছিল এই যে তা জীবনের থেকে বহুদূরবর্তী গাম্ভীর্যময় বাতাবরণ সৃষ্টি করেনি বরং তা প্রত্যেক দিনের জীবনযাত্রার থেকেই সাহিত্য ক্ষেত্রে সহজে প্রবেশ করেছে কোন বর্ণবহুল আড়ম্বর পূর্ণ ঐশ্বর্য গায়ে না মেখেই। চলিত বাক্যও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সাবলীল স্বতস্ফূর্ত আবেদন নিয়ে তাঁর লেখনীতে সৃষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ যে ঘটনা যেভাবে ঘটেছে তাকে গদ্যরূপায়ণ দিতে গিয়ে তা সে সাধু হোক বা চলিতই হোক কোথাও কৃত্রিমভাবে উপস্থাপিত হয়নি বরং যে ভাবে সেটি ঘটেছে সেটিকে ঠিক সেইভাবেই বাক্যে বিবৃত করেছেন। কোন কৃত্রিমতা সেই রূপায়ণে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। গদ্যভাবনায় যে দুটি প্রচলিত রীতি সাধু ও চলিত বাক্যগঠন—দুটিতেই তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা সম্পর্কে সমালোচক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মন্তব্য উল্লেখ করা যায় — *'প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের স্টাইলের প্রধান গুণ এই যে, এখানে তথাকথিত সাধুভাষা ও চলিত ভাষার সমন্বয় হইয়াছে। চলিত ভাষার স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা এবং সাধুভাষার সমৃদ্ধির মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন।'*[১৬]

শরৎচন্দ্রের গল্পোন্যাসের বহিরঙ্গ বা কাঠামো সাধুবাক্য আর চরিত্রের সংলাপ চলিত বাক্যে রচিত হয়েছে। যদিও সাধু ও চলিত বাক্যের মাঝে কোন ব্যবধানই তিনি মানেননি। তাঁর সাধুবাক্য

চলিত বাক্যেরই কাছাকাছি। অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়াপদ ছাড়া শব্দব্যবহার ও বাগ্‌ভঙ্গির দিক দিয়ে এ বাক্যগঠনের সাধু-চলিতের বিভাজন নামান্তর মাত্র,

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্তের কণ্ঠে পূর্বস্মৃতি রোমন্থন সূত্রে একজাতীয় দার্শনিক ঔদাসীণ্য সুলভ প্রসন্ন গদ্যভাষা সাধুবাক্যে প্রকাশিত হয়েছে এভাবে—*'আমার এই ভবঘুরে জীবনের অপরাহ্নবেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।'*[১৭] সাধুগদ্যে রচিত বাক্য পদ্ধতিতে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের বারবার ব্যবহারে ভাষা প্রবহমানতা পেয়েছে। 'ভবঘুরে' এই সমাসবদ্ধ শব্দটি জীবনের বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হয়ে জীবনপ্রবাহকে ব্যঞ্জিত করেছে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে মহিম-অচলা ও সুরেশের ত্রিকোণ প্রেম ব্যর্থতায় ও সকরুণ ভাবে পরিসমাপ্ত ঘটলে সেই নিদারুণ মর্মদাহ সুরেশের মৃত্যুর পরে মহিমের অন্তরে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। তার হৃদয়ের নিবিড় যাতনা সাধু বাক্যরীতিতে লেখক তুলে ধরেছেন—*'অচলাকে তিল তিল করিয়া ভালবাসিবার প্রথম ইতিহাস তাহার কাছে অস্পষ্ট, কিন্তু এই মেয়েটিকেই কেন্দ্র করিয়া তাহার জীবনের উপর দিয়া যাহা বহিয়া, গিয়াছে, তাহা যেমন প্রলয়ের মত অসীম, তেমনি উপমাবিহীন। আবার নিঃশব্দ সহিষ্ণুতার শক্তিও বিধাতা তাহাকে হিসাব করিয়া দেন নাই। তাহার গৃহ যখন বাহির এবং ভিতর হইতে জ্বলিয়া উঠিল তখন সে ঐখানে দাঁড়াইয়া ভস্মসাৎ হইল --- এতটুকু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংসারে ছড়াইতে পাইল না।'*[১৮]—প্রেমের ধ্বংসাত্মক রূপ তার সর্বগ্রাসী লেলিহান প্রবৃত্তি প্রলয়ের সঙ্গে উপমিত হয়ে বাক্যে ব্যঞ্জনা এনেছে। সাধু গদ্যভাষা উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারে সংবেদনময় হৃদয়বিদারী হয়েছে। বাক্যগঠনের সর্বত্র সংগতি সমগ্র বিবৃতিকে বাঙ্ময় করে তুলেছে।

বাক্য রচনায় চলিত গদ্যরীতি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে' থেকেই শুরু হয়। সাধুভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার পার্থক্য শুধু ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের রূপ পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে না চলিতের নিজস্ব বাগ্‌ভঙ্গি ও বৈশিষ্ট্য। তাকে সাধু থেকে পৃথক করে। এ ভাষার স্বতঃস্ফূর্ততা ও প্রাণময়তা জীবন থেকে উদ্ভূত। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের নৈশাভিযানে জলে ভাসমান শিশুর মৃতদেহ দেখে ইন্দ্রনাথের মন্তব্য চলিত ভাষায় বাক্যে স্বচ্ছন্দ ভাবে উৎসারিত হয় —*'আরে এ যে মড়া, মড়ার আবার জাত কি? এই যেমন আমাদের ডিঙিটা—এর কি জাত আছে?*

সহজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবন সম্পর্কে এমন গভীর উক্তি – জীবন–মৃত্যুর সংজ্ঞা জ্ঞাপন চলতি বাক্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। 'আরে' অব্যয় যোগে প্রশ্নবোধক বাক্যে বিবৃতিটি গঠিত হয়ে চরিত্রটির বিশাল অন্তরদেশকে উন্মোচিত করেছে। চলিত গদ্যে গঠিত বাক্য শিল্পীর সংবেদনময়তার স্পর্শে বাঙ্ময় হয়েছে।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বে শাহজীর দেহ সমাহিত করার পর ভূলুণ্ঠিতা অন্নদাদিদির কান্নায় চর্তুদিক প্রতিধ্বনিত হয় – 'মা গঙ্গা আমাকেও পায়ে স্থান দাও মা। আমার যে আর কোথাও জায়গা নেই।[২০] সহজ ভাষায় চলতি গদ্যে গঠিত বাক্যের সুসংগতিতে হৃদয় নিঙরানো কান্নায় নিঃস্ব নারীর অন্তর উন্মোচিত হয়েছে।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের রচনায় বাংলা বাক্যতত্ত্বের তিনটি রূপই – সরল ও মিশ্র ও যৌগিক সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সরল ও মিশ্র বা জটিল বাক্যে বিবৃতি রচিত হলেও বস্তুতঃ তিনি যৌগিক বাক্যবন্ধেই বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলেন। 'শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বে' রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের বিদায়বেলায় দৃশ্যটি বর্ণিত হয়েছে এ ভাবেই – 'অন্ধকার রাত্রি ভাল করিয়া কিছুই দেখা যায় না, কেবল স্টেশন প্লাট–' ফর্মের গোটাকতক কেরোসিনের আলো–মন্থর–গতিশীল–গাড়ির সেই খোলা জানলার একটি অস্পষ্ট নারীমূর্তির উপরে বার–কয়েক আলোকপাত করিল।[২১] – দুটি বাক্য 'কেবল' এই সংযোজক অব্যয় সহযোগে যুক্ত হয়ে যৌগিক বাক্যে পরিণত হয়েছে ও সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার দুটি বাক্যে প্রযুক্ত হয়ে বিবৃতিটিতে রোমান্টিক বিধুরতা সৃষ্টি করেছে। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী দুটি প্রেমিক হৃদয়ের অচরিতার্থতা তাদের ভিন্ন পথ–যাত্রায় ব্যঞ্জিত হল। অস্পষ্ট নারীমূর্তির উপরে বার কয়েক আলোকপাতের প্রসঙ্গটি প্রেমের অনুচ্চারিত ও অপ্রকাশিত দিকটিকে তুলে ধরেছে। শ্রীকান্ত উপন্যাসের 'প্রথম পর্বে' অন্নদাদিদির স্বামী শাহজী চরিত্রের পাপী ও অত্যাচারী স্বভাব অসাধারণ বাক্যবন্ধে ধরা পড়েছে – "শাহজীর কণ্ঠস্বর ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল এবং দেখিতে তাহা উন্মত্ত চীৎকারে পরিনত হইল"।[২২] এখানে সংযোজক অব্যয় 'এবং' 'সহযোগে' ও 'দেখিতে' 'দেখিতে' অসমাপিকা ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব প্রয়োগে যৌগিক বাক্যবন্ধে ভাবাবেগময় নাটকীয়তা এসেছে ও খল দুর্বত্ত শাহজী চরিত্রের নিষ্ঠুরতা 'উন্মত্ত' ও 'উত্তপ্ত' তৎসম শব্দসহযোগে উন্মোচিত হয়েছে।

'পথের দাবী' উপন্যাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের অনিশ্চিত বিপদজনক পরিবেশের আভাস প্রভাতকালীন দুর্যোগময় পরিস্থিতির প্রাকৃতিক বর্ণনের ভাষায় যৌগিক বাক্যগঠন অসাধারন ভাবে ধরা পড়েছে – "পরদিন প্রভাত হইতেই আকাশে ধীরে ধীরে মেঘ জমা হইতেছিল, রাত্রে ফোঁটা কয়েক জলও পড়িয়াছিল, কিন্তু আজ মধ্যাহ্নকাল হইতে বৃষ্টি এবং বাতাস চাপিয়া আসিল"[২৩] – ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জটিলতম বিপদময় পরিস্থিতির সংকেত প্রাকৃতিক জগতের বর্ননায় ব্যক্ত হয়েছে। যৌগিক বাক্যবন্ধে সাধুগদ্যে 'প্রভাত' 'আকাশ' 'মেঘ' 'রাত্রে' 'জল' 'বাতাস' 'মধ্যাহ্নকাল', বৃষ্টি তৎসম শব্দ চয়নে কিন্তু সংযোজক অব্যয় ব্যবহারে ও সংযোজক অব্যয় পদ আদৃশ্য থেকে আসন্ন বিপদের সংকেত দিয়েছে। যৌগিক বাক্য চিত্রময়তা এনেছে বক্তব্যে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরেশ ও অচলার নির্লজ্জ প্রেমের প্রাণহীন কদর্য লীলার বর্ণনায় আমরা বিস্মিত হই। যৌগিক ও জটিল বাক্যে সেই কলঙ্কিত অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে এভাবে – 'এই আবেগ উচ্ছ্বাসহীন নাটকের পরিসমাপ্তি হয়ত এমনি নিস্পন্দ মৌনতার ভিতর দিয়াই ঘটিবে, কিন্তু নিমেষ না গত হইতেই আবার বোধ হইতে লাগিল, এই উন্মত্ত নির্লজ্জতার বুঝি সীমা নাই, শেষ নাই, সর্বদিক সর্বকাল ব্যাপিয়াই এই মত্ততা চিরদিন বুঝি এমনি অনন্ত ও অক্ষয় হইয়া রহিবে – কোনদিন কোন যুগেও ইহার আর বিরাম মিলিবে না, বিচ্ছেদ ঘটিবেনা।[২৪]' কখনও সংযোজক অব্যয় 'কিন্তু' ব্যবহার আবার কখনও সংযোজক অব্যয় উহ্য থেকে বাক্যে নাটকীয় ভাবাবেগ এনেছে। 'যে' এই অব্যয় উপবাক্যের পূর্বে প্রযুক্ত না হয়ে সুরেশ চরিত্রের উন্মত্ত হৃদয়াবেগকে তুলে ধরেছে। 'নাই' নঞর্থক ক্রিয়াপদ ও 'না' নঞর্থক অব্যয় পদ জটিল ও যৌগিক বাক্যবন্ধে বিবৃত বর্ণনাকে মর্মস্পশী করেছে। বিহ্বল হৃদয়াবেগ ভাষায় যথার্থ রূপ পেয়েছে।

শরৎচন্দ্রের গদ্যভাবনা কল্পনা সমৃদ্ধই শুধু নয়, সেটি ছন্দোবন্ধ ছিল। বাক্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এমন একটি সুন্দর সামঞ্জস্য আছে যার শ্রুতি মাধুর্যে পাঠক মুগ্ধ হয়েছে। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের বাক্যরীতিতে এই সামঞ্জস্য আশ্চর্য ভাবে খুঁজে পাই – 'কিন্তু এ না থাকা যে কি না থাকা, এ যাওয়া যে কি যাওয়া, তাহাসতীশের চেয়ে কে বেশী জানে। সরোজিনীর চেয়ে কে বেশী দেখিয়াছে। সাবিত্রীর চেয়ে কে বেশী শুনিয়াছে।'[২৫] বিবৃতির অন্তর্গত বাক্যগুলির সুসংগঠিত ও সুসামঞ্জস্য ভাষাকে ধ্বনিময় ব্যঞ্জনা দিয়েছে। গদ্যভাষায় কাব্যিক স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে।

বাক্যগঠনের সমান্তরলতার গুণ তাঁর গদ্যভাষাকে কবিতার কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে প্রায়ই —

'গৃহদাহ' উপন্যাসে এই জাতীয় সুসমঞ্জস বাক্য উচ্ছ্বসিত হয়ে ভাষায় কাব্যময়তা এনেছে— *'বাহিরের মত্ত রাত্রি তেমনি দাপাদাপি করিতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেমনি বারংবার অন্ধকার চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেরিতে লাগিল, উচ্ছৃঙ্খল ঝড়জল তেমনি ভাবেই সমস্ত প্রকৃতি লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু এই দুইটি অভিশপ্ত নরনারীর অন্ধ হৃদয়তলে যে প্রলয় গর্জিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহার কাছে এ সমস্ত একেবারে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হইয়া বাহিরেই পড়িয়া রহিল।'*[২৬] — বাক্যের শব্দচয়ন অন্তর্নিহিত ধ্বণিরোল ও শব্দঝংকার বাক্যাংশের মধ্যে সুসংহতি গদ্যভাষায় ছন্দোময়তা এনেছে।'

'শরৎচন্দ্র' গদ্যভাষায় দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করলেও অনেকক্ষেত্রেই তিনি সংক্ষিপ্ত বাক্যও ব্যবহার করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত বাক্য বক্তব্যটিকে গতিশীল করে তুলেছে ও পাঠকের কৌতূহলকে জাগ্রত করেছে বারবার।—'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বে এমনি দৃষ্টান্ত পাই—*'সেদিনের রাত্রিটা যেমন গরম তেমনি অন্ধকার। কোথাও গাছের একটি পাতা পর্যন্ত নড়েনা। ছাদের উপর সবাই শুইয়া ছিলাম। বারোটা বাজে, তথাপি কাহারো চোখে নিদ্রা নাই। হঠাৎ কি মধুর বংশীস্বর কানে আসিয়া লাগিল। সহজ রামপ্রসাদী সুর কত ত শুনিয়াছি, কিন্তু বাঁশীতে যে এমন মুগ্ধ করিয়া দিতে পারে তাহা জানিতাম না।'*[২৭]—ছোট ছোট সংক্ষিপ্ত সংহত বাক্যের ব্যবহার বক্তব্যকে গতিময় করেছে। স্মৃতির মণিকোঠায় অসংখ্য ঘটনার ভীড়ে বিশেষ কোন স্মৃতির রোমন্থনের উপযোগী হয়েছে এ গদ্য ভাষায় বাক্যগঠন। 'যেমন-তেমন' ইত্যাদি সাপেক্ষ-জোড়-অব্যয় পদের ব্যবহার ভাষায় একটি নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ইন্দ্রনাথ চরিত্রের অসাধারণত্ব ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত বাক্যের ব্যবহার এই উপন্যাসেরই অন্যত্র বক্তব্যকে বিশেষত্ব দিয়েছে এ ভাবেই—*'সে মুখে একবার বলিল ভয় নেই। কিন্তু গলাটা তাহার যেন কাঁপিয়া গেল। কিন্তু সে থামিল না। প্রাণপনে লগি ঠেলিয়া ক্রমাগত ভিতরে লুকাইয়া চেষ্টা করিতে লাগিল। সমস্ত চড়াটা জলে জলময়। তাহার উপর আট দশ হাত দীর্ঘ ভুট্টা এবং জনারের গাছে। ভিতরে এই দুটি চোর'*[২৮]— নির্ভীক দুটি বালকের সাহসিকতার চমকপ্রদ কাহিনি কথাশিল্পী সংক্ষিপ্ত কাটা কাটা বাক্যে বর্ণনা করেছেন। বাক্যগঠনের বিশেষত্ব ভাববস্তুকে চিত্রময় করে তুলেছে ও গল্পের আবহ নির্মাণ করেছে। পাঠক এ গদ্যের ছাঁদে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

ভাষা ভাবনায় শরৎচন্দ্রের গদ্যে কোথাও কোথাও বাক্য সংক্ষিপ্ত হয়ে একটিই মাত্র শব্দে পরিণত হয়েছে। *"কিন্তু কি এ? বিদ্রূপ? ঈর্ষা ? বিবেক?"*[২৯]—বাক্যের অতি সংক্ষিপ্ত সরলীকরণ চরিত্রহীন কিরণময়ী চরিত্রের রহস্যময়তা ভেদ করে তার স্বরূপ অনুসন্ধান করতে প্রয়াসী হয়েছে। চরিত্রের গূঢ় দিকটিকে আভাসিত করতে ভাষা নাটকীয় হয়ে পড়েছে।

আবার 'পথের দাবী' উপন্যাসেও সংক্ষিপ্ত বাক্যের নিদর্শন পাওয়া যায় —*'তা হোক। কিন্তু এ যে ফাইন। শাস্তি। রাজদণ্ড।'*[৩০]—অপূর্ব চরিত্রের হতবাক্ অবস্থা সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহারে ধরা পড়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যে নিরুচ্চার প্রশ্নে আকুল হয়েছে বক্তব্য। সমকালীন আইন-ব্যবস্থার বিচারের নামে প্রহসন ধরা পড়েছে বিবৃতিটিতে।

একই বস্তুকে উপলক্ষ করে সমভাবযুক্ত বিভিন্ন বাক্যাংশ পরপর প্রয়োগের দ্বারা শরৎচন্দ্র বক্তব্যবিষয়কে মাত্রাময় করে তুলতে পারতেন। তাঁর গদ্যভাবনার আকর্ষণী শক্তর অন্যতম উপকরণ ছিল এটি। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে পাই —*'তাহার গৈরিক বস্ত্র, তাহার এলায়িত রুক্ষ কেশভার, তাহার পাণ্ডুর ওষ্ঠাধর, তাহার সবল সুস্থ ঋজু দেহ সমস্তই সে যেন দুই বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া নিঃশব্দে গিলিতে লাগিল।'*[৩১]—ভৈরবী ষোড়শীর তপস্যাকঠোর পবিত্র মূর্তি সমভাব যুক্ত শব্দে গঠিত বাক্যাংশের সহাবস্থানে চিত্রময় হয়ে উঠেছে। বাক্যের গাঠনিক বৈশিষ্ট্য ভাষাকে শরীরী করে তুলেছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে পাই এ জাতীয় সমভাবযুক্ত বিভিন্ন বাক্যাংশে গঠিত বিবৃতি—*'করুণায়, মমতায় ও অযাচিত দাক্ষিণ্যে সমস্ত অন্তরটা আমার চক্ষুর নিমিষে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।'*[৩২] বৈষ্ণবী কমললতার প্রতি শ্রীকান্তের হৃদয়ের নিজস্ব অনুভব সমভাবযুক্ত শব্দচয়নে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর গদ্যভাবনায় প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার করেছেন বেশী। ভাষা এতে আবেগময় ও নাটকীয় হয়ে উঠত। বিবৃত অংশে একাধিকবার প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার 'গৃহদাহ' উপন্যাসে 'অচলা'র আত্মকথনে খুঁজে পাই—*'এই যে তাহার জীবন-কুরুক্ষেত্র ঘেরিয়া এত বড় একটা কদর্য সংগ্রাম চলিয়াছে, সংসারে ইহার কি আবশ্যক ছিল? দুনিয়ার সমস্ত জ্বালা, সমস্ত হীনতা সকল স্বার্থ মিটাইয়া সে কি ওই রাত্রির মত আজই শেষ হইয়া যাইবে? তারপরে সমস্ত জীবনটা কি তাহার কুরুক্ষেত্রের মত কেবল শ্মশান হইয়া যুগযুগ পড়িয়া রহিবে? এখানে কি চিতার দাহ চিহ্ন*

কোনদিন মিলাইবে না? পৃথিবীতে ইহাও কি প্রয়োজনের মধ্যে?[৩৩]—প্রশ্নবোধক বাক্য তৎসম শব্দ চয়নে গঠিত হয়ে মানবজীবন পর্যালোচনায় সক্ষম হয়েছে। বারবার প্রশ্ন-বাক্য ব্যবহার বক্তা চরিত্রের হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রশ্ন-মথিত দীর্ঘশ্বাস, পাপ-পুণ্য সম্পর্কিত প্রসঙ্গের চিরন্তন অপরিহার্যতার প্রশ্ন তুলেছে। ভাষা জীবনের সঠিক লক্ষ অনুসন্ধানে রত হয়েছে।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসেও পাই—*'ভিতরের সজলকণ্ঠ এবার কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল—সাবিত্রী একটিবার বলে যাও; আমি এতদিন কি শুধু ঘুমের ঘোরেই এই দুঃখের বোঝা বয়ে বেরিয়েছি? আমার ভাগে কি সবই ভুল? সবই মিথ্যে? এই অপরিসীম দুঃখটাও কি আমার অদৃষ্টে আগাগোড়া ফাঁকি?*[৩৪] চলিত গদ্যে প্রশ্নবোধক বাক্য বারবার প্রযুক্ত হয়ে বক্তা সতীশের অন্তর স্পষ্ট উন্মোচিত হয়েছে। চলিত ক্রিয়াপদে বাক্য উচ্ছ্বসিত হয়েছে। একাধিকবার প্রশ্নবাক্য ব্যবহারে চরিত্রের হৃদয়ের আকুলতা ধরা পড়েছে। প্রেমের বিচিত্র অভিব্যক্তি ভাষায় রূপ পেয়েছে। ভাষা আবেগে ও আবেদনে অধীর হয়ে পড়েছে।

শরৎচন্দ্র বাক্যগঠনে ক্রিয়াপদ-ব্যবহারে বিশেষত্ব এনেছেন। প্রয়োজন-বোধে তিনি ক্রিয়াপদ সুবিধে মত স্থানে বসাতেন। যা বাক্য গঠনেক প্রচলিত রীতিকে ভেঙ্গে ভাষায় আবেগধর্মী আবেদন আনত। ক্রিয়াপদকে বাক্যের প্রারম্ভ অংশে প্রযুক্ত করে বক্তব্যকে গভীর অনুভব-সমৃদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হতেন শরৎচন্দ্র।

'পরিণীতা' উপন্যাসে ক্রিয়াপদ বাক্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে চরিত্রের অবরুদ্ধ ভাবনাকে উন্মোচিত এভাবেই করেছে —*'রহিয়া রহিয়া হৃদয়ের অন্তরতম স্থল পর্যন্ত এমন করিয়া নিরাশ বেদনায় আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে কেন?*[৩৫]

আবার এই উপন্যাসের অন্যত্র পাওয়া যায়—*'পুড়িয়া পুড়িয়া তাহার সাতদিন কাটিয়াছে, আজও সন্ধ্যার পর নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে সেই আগুন জ্বালিয়া দিয়াই বসিয়াছিল।*[৩৬]—প্রেমের অন্তর্দাহের তীব্রতা শেখর চিরত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। অসমাপিকা ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব প্রয়োগ বাক্যের প্রারম্ভে প্রযুক্ত হয়ে ভাষাকে ভাবাবেগময় সংবেদনশীল করে তুলেছে। ক্রিয়াপদ প্রয়োগের বিশিষ্টতা বাক্যে অন্য মাত্রা দিয়েছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রাত্রিবেলায় নির্জন শ্মশান ভূমিতে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে শ্রীকান্তের হতচেন অবস্থার বর্ণনায় বাক্যটি গঠিত হয়েছে এ ভাবেই—*'বলিতেছিলাম যে সেই ধূলা-বালি ভরা বাঁধের উপর যখন হতচ্ছাসের মত বসিয়া পড়িলাম, তখনই শুধু দুটি লঘু পদধ্বনি শ্মশানের অভ্যন্তরে গিয়া ধীরে ধীরে মিলাইল।*'[৩৭]—ক্রিয়াপদ বাক্যের পূর্বে অবস্থিত হয়ে বক্তার ভয়াবহ স্মৃতি রোমন্থনের আবহ নির্মাণ করেছে। নির্জন অন্ধকার প্রেতভূমি শ্রীকান্ত চরিত্রে যে কতদূর ভয় সঞ্চার করেছিল বক্তার কণ্ঠে তাই প্রতিধ্বনিত। বাক্যের গঠনেও সেই গল্প বলার সুর অনুরণিত হয়েছে।

'শ্রীকান্ত উপন্যাসের অন্যত্র পাই —*'বলিব আর কি! আগুন নিবিয়া গেলে শুধু জলে যে ইঞ্জিন চলে না, এ ত জানা কথা।*'[৩৮]—'বলিব' সমাপিকা ক্রিয়াপদ বাক্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে শ্রীকান্ত চরিত্রের জীবন সম্পর্কিত উপলব্ধিকে ব্যক্ত করেছে। শরৎচন্দ্র বাক্য ভাবনায় একই ক্রিয়াপদের একাধিকবার ব্যবহার করে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আনতেন। ক্রিয়াপদের এই বিশেষ প্রয়োগরীতি বক্তব্যকে নাটকীয় করে তুলত। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সাবিত্রী সতীশকে উদ্দেশ্য করে বলেছে-- *'তুমি কসাইয়ের চেয়েও নিষ্ঠুর—তুমি যাও। তুমি যাও। তোমার পায়ে পড়ি তুমি যাও।*'[৩৯] —'যাও' এই ক্রিয়াপদ বাক্যে বারবার ব্যবহৃত হয়ে বক্তার হৃদয়ের অভিমান ক্ষোভ ও হতাশাকে ব্যঞ্জিত করেছে। সতীশ কর্ত্তৃক অপমানিত সাবিত্রীর অন্তরের সুতীব্র অভিমান 'যাও' ক্রিয়াপদের একাধিক ব্যবহারে ঝরে পড়েছে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরেশের অচলাকে উদ্দেশ্য করে বিবৃতিটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। সুরেশ বলেছে—*'স্বামীর ঘরে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের উপর বলেছিলে একজন পরপুরুশকে ভালবাস —সে কি ভুলে গেছ? যে লোক ঘরে আগুন দিয়ে তোমার স্বামীকে পোড়াতে চেয়েছিল বলে তোমার বিশ্বাস তার সঙ্গেই চলে আসতে চেয়েছিল এবং এলেও তাই স্মরণ হয়? তার ঘরে তার আশ্রয়ে বাস করে গোপনে কেঁদে তাকেই সঙ্গে আসতে সেধেছিলে মনে পড়ে।*'[৪০] — 'মনে পড়া', 'ভুলে যাওয়া', 'স্মরণ' ইত্যাদি এক জাতীয় ক্রিয়াপদের বিভিন্ন প্রতিশব্দে ব্যবহার বক্তব্যকে ভাবাবেগময় করে তুলেছিল। সুরেশের অপরাধী হৃদয়ের আত্মপক্ষ সমর্থনের অভীপ্সা অসহায় ক্রোধে ফোটে পড়েছে। একই ক্রিয়াপদের বিভিন্নভাবে ব্যবহারে বাক্যে সেই পুঞ্জীভূত ক্রোধ ফোটে পড়েছে।

'নাই'—নিষেধার্থক অব্যয় সহযোগে গঠিত ক্রিয়াপদের ব্যবহারের শরৎচন্দ্র বাক্যে শিল্পময়তা ঘটিয়েছেন। বিবৃত বক্তব্যে 'নাই' এই ক্রিয়াপদটির ব্যবহার তাঁর গদ্যভাবনায় বিশেষ দ্যোতনা সঞ্চার করত।

'বিরাজ বৌ' উপন্যাসে পাই —*'বাহিরে বৃষ্টির শব্দে, শিল্পীর ডাকে, বাতাসের স্বননে কেবল নাই নাই শব্দই তাহার দুই কানের মধ্যে নিরন্তর প্রবেশ করিতে লাগিল। ভাঁড়ারে চাল নাই, গোলায় ধান নাই, বাগানে ফল নাই, পুকুরে মাছ নাই—সুখ নাই, শান্তি নাই। স্বাস্থ্য নাই -- ও বাড়িতে ছোট বৌ নাই সকলের সঙ্গে আর তার স্বামী ও নাই'*[৪১]—'নাই' নঞর্থক ক্রিয়াপদটির বারবার ব্যবহার সঙ্গীতের ধুয়াপদের মতো বেজেছে ও বিরাজের জীবনের সর্ববিধ ব্যর্থতায় ঝরে পড়েছে। সর্বত্র এক ভয়াবহ 'না'-এর সম্মুখীন হয়েছে সে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলার ভাবনায় এই নেতিবাদের সুর এ ভাবেই প্রকাশিত —*'সেখানে ভয় নাই, ভাবনা নাই, কামনা নাই, কল্পনা নাই—যতদূর দেখা যায়, ভবিষ্যতের আকাশ ধু ধু করিতেছে। তাহার রঙ নাই, মূর্তি নাই, গতি নাই, প্রকৃতি নাই—একেবারে নির্বিকার, একেবারে একান্ত শূণ্য।'*[৪২] —অচলার রিক্ত হৃদয়ের হাহাকার, আপন কৃতকর্মের ফলশ্রুতি জনিত নিঃস্ব অন্তর ও তার অজানা ভবিষ্যৎ জীবনের ভয়াবহ দুর্ভাবনা সর্বত্র নেতির সুরে বেজেছে। 'নাই' ক্রিয়াপদটির ব্যবহার ভাষাকে কান্নার বাণীরূপ দিয়েছে।

'পথের দাবী' উপন্যাসে 'সব্যসাচী'—স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানী, চরিত্রটি নিজ চরিত্রের পর্যালোচনা করেছে আশ্চর্য দৃঢ় ব্যক্তিত্বময় ভাষায়। 'নাই' নিষেধার্থক অব্যয় পদ যোগে গঠিত ক্রিয়াপদ ব্যক্তি চরিত্রটির স্বাতন্ত্র্যকে তুলে ধরেছে স্বচ্ছন্দ ভাষায় —*'আমার মায়া নেই, স্নেহ নেই, দয়া নেই, পাপপুণ্য আমার কাছে মিথ্যা পরিহাস।'*[৪৩]—বিপ্লবী চরিত্রের কঠোরতাময় দৃঢ় পৌরুষ বক্তব্যটির বাক্যাংশে 'নেই' ক্রিয়াপদের ব্যবহারে প্রকাশিত। প্রবল দেশপ্রেমের কাছে মানবিক আবেগের তুচ্ছতা যে নিতান্তই মূল্যহীন তা সব্যসাচীর আত্মমূল্যায়নে নঞর্থক ক্রিয়াপদে স্পষ্ট হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের বাক্যগঠন রীতির অন্যতম বিশিষ্টতা হল বিশেষণ পদের ব্যঞ্জনাময় ব্যবহার কলা। বিশেষণ পদের বাহুল্যের প্রতি শরৎচন্দ্রের বিশেষ প্রবণতা ছিল বলা যায়। একাধিক বিশেষণ পদের প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যকে গতিময় নাট্য রসাত্মক করে তুলেছিল।

শ্রীকান্ত উপন্যাসে রাত্রির তমসাময় রূপের সৌন্দর্যে অভিভূত শ্রীকান্তের অনুভূতি—'বায়ুলেশহীন নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশিথিনীর সে যেন এক বিরাট কালী মূর্তি।'[৪৪] রাত্রির চিরকালীন রহস্যময়তা বিশেষ এই বিশেষণ পদগুলির সু প্রয়োগে যথাযথ হয়েছে। তৎসম শব্দ 'বায়ুলেশহীন নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ ও নিঃসঙগ বিশেষণ পদ রূপে নিশিথিনীকে বিশেষিত করেছে ও ভাষায় প্রত্যক্ষতা এনেছে বর্ণনা যেন দৃষ্টি গ্রাহ্য হয়েছে। বাক্যে তারই সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেই অন্ধকার রজনীতে গঙ্গার তীব্র স্রোত' লেখকের বর্ণনায় বিশেষণ পদের প্রয়োগে সুচিত্রিত হয়েছে। উদ্দাম সেই গঙ্গাস্রোতের বর্ণনাটি পাই—*'এই দিক-চিহ্নহীন অন্ধকার নিশীথে আবর্ত সঙ্কুল গভীর তীব্র জল প্রবাহে সাত ক্রোশ ভাসিয়া গিয়া ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা।'*[৪৫]—অন্ধকার রজনীর প্রেক্ষিতে গঙ্গার তীব্র স্রোত একাধিক বিশেষণ পদ 'দিক-চিহ্নহীন' অন্ধকার ও আবর্তসঙ্কুল গভীর তীব্র ইত্যাদির প্রয়োগে ভাষা চিত্রময় হয়ে উঠেছে। বাক্যগঠনে যেন সেই জলস্রোতের তীব্র স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেরই অন্যত্র পাই —*'আজ এই ভ্রষ্ট জীবনের বিশৃঙ্খল ঘটনার গ্রন্থিগুলা আর একবার বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি'*[৪৬] —জীবন যার অপর নাম চলমান প্রবাহ সেটি যুক্তব্যঞ্জনে গঠিত বিশেষণ পদ — 'ভ্রষ্ট', 'বিশৃঙ্খল', ইত্যাদির প্রয়োগে ছন্দোময় চলচ্ছক্তি পেয়েছে। বাক্যটি বিশেষণ পদের প্রয়োগে শান্ত নিরাসক্ত ঔদাসীন্য পেয়েছে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে পাওয়া যায় —*'এই আবেগ উচ্ছ্বাসহীন নাটকের পরিসমাপ্তি হয়ত এমনি নিস্পন্দ মৌনতার ভিতর দিয়াই ঘটিবে'*[৪৭]—মানব হৃদয়ের অবৈধ কামনা বাসনাময় প্রবৃত্তির অনিবার্যতাকে, ভাষাশিল্পী ব্যঞ্জনাময় বিশেষণ পদ 'আবেগ 'উচ্ছ্বাসহীন' ও 'নিস্পন্দ' ইত্যাদি প্রয়োগে উচ্ছ্বসিত করেছেন। প্রেমের ভালবাসাবর্জিত জৈব তাড়না, সুরেশ ও অচলার হৃদয়হীন শরীরী ক্রিয়ায় 'আবেগ উচ্ছ্বাসহীন ও 'নিস্পন্দমৌনতা' বিশেষণ পদের প্রয়োগে বাক্যের প্রকাশিত হয়েছে।

বাক্যগঠনে ধ্বন্যাত্মক পদের ব্যবহার ভাষাকে তীব্র সংবেদনশীল করেছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিচিত্র অভিব্যক্তিময় ব্যবহার শরৎচন্দ্রের বাক্যভাবনার উল্লেখযোগ্য চরিত্র—*'খস্-স্ বালুর চরে নৌকা বাঁধিয়াছে'*[৪৮]—শ্রীকান্ত উপন্যাসে বালির চরায় নৌকা বাঁধার শব্দ 'খস্-স্'—এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগে ধ্বনিময় হয়ে উঠেছে বাক্য।

আবার জলস্রোতের অবিরাম প্রবহমানতা বোঝাতে ভাষাকে ধ্বনিময় করেছেন এ ভাবেই— *'বহু দূরাগত তীব্র জলপ্রবাহের অবিশ্রাম—হু-হু-হু-আর্তনাদ'* [৪৯]—শ্রীকান্ত উপন্যাসে জলপ্রবাহের তীব্রতাকে 'হু-হু-হু' ধ্বন্যাত্মক শব্দের সাহায্যে ধ্বনিময় করে তুলে বুক ফাটা আর্তধ্বনিতে পর্যবসিত করেছেন। ভাষা প্রতিধ্বনি হয়ে উঠেছে এখানে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের অন্যত্র ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের মাছচুরি সংক্রান্ত নৈশাভিযানের কাহিনিতে দুর্ভেদ্য জঙ্গলাকীর্ণ গঙ্গার নৌকাযাত্রার বর্ণনায় সর্পদংশনের অজানা আশঙ্কায় শ্রীকান্তের ব্যাকুল মন ধরা পড়েছে—*'ছপাৎ করিয়া একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে'*[৫০]—'ছপাৎ' ধ্বন্যাত্মক শব্দটির বাক্যে প্রয়োগ ভাষাকে শঙ্কিত করে তুলেছে।

এ ছাড়া জেলেদের ছুটে আসার বর্ণনায় লেখক এ কাহিনিতে ভীতি সঞ্চার করেছে এভাবেই— *'প্রবল জল-তাড়নায় ছপাছপ শব্দ করিয়া চারখানা নৌকা আমাদের গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে'*[৫১]—নৌকা বাওয়ার শব্দ 'ছপাছপ' ধ্বন্যাত্মক অব্যয় পদ যোগে বর্ণিত হয়ে বাক্যটি পাঠকমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করেছে।

আবার এই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের অন্য পর্বে পাই বাক্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের আশ্চর্য ব্যবহার — *'জাহাজের বাঁশী অসীম বায়ুবেগে থরথর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেই লাগিল'*[৫২]—ভয়ানক দুর্যোগময় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জাহাজের বিপদ-সঙ্কেত সূচক বাঁশীর ধ্বনি 'থরথর' ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগে অজানা আশঙ্কাকে ব্যঞ্জিত করেছে।

'বড়দিদি' উপন্যাসের সমাপ্তিতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত সুরেন্দ্রনাথের নৌকা নদীতে যাত্রা করেছে। সেই চন্দ্রালোকিত রজনীতে বড়দিদির কোমল স্নেহস্পর্শে আবিষ্ট সুরেন্দ্রনাথের শেষ যাত্রায় জলের বর্ণনা বাক্যে ধ্বনিময় হয়ে উঠেছে —'তর্‌তর্ ছল্‌ছল্ করিয়া নৌকা ছুটিয়াছে'—'তর্‌তর্ ছল্‌ছল্' ইত্যাদি ধ্বন্যাত্মক অব্যয় নদীর প্রবহমানতার পাশাপাশি মানবজীবনের পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছে।

'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসে স্বর্ণময়ীর নিষ্ঠুরতা— জ্ঞানদার প্রতি তার চরম অমানবিকতা হাসির শব্দে প্রতিধ্বনিত হয় — *'স্বর্ণ খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া কহিলেন'*[৫৪]—ভাগ্য নিপীড়িতা অসহায়া কিশোরীর প্রতি ব্যঙ্গ হাসির শব্দে প্রকাশিত হয়েছে ও স্বর্ণময়ী চরিত্রের কদর্য অন্তরকে তুলে ধরেছে। বাক্য সেই নিষ্ঠুর ঘটনার সাক্ষী থেকেছে।

শরৎচন্দ্রের বাক্যগঠনে 'থাকলেই ত' 'ফেললেই' বা 'বটেই ত', 'একদিন ত', তাইবা প্রভৃতি অব্যয় শব্দের শেষে ব্যবহৃত হয়ে ভাষাকে আবেগময় ও নাটকীয় করে তুলত। পাঠক ভাষার এই সজীবতার স্পর্শে আবিষ্ট হত। 'বোধ করি' বোধ হয়' 'কিন্তু', 'হয়ত', 'কিম্বা', 'যথার্থই', 'সবিশেষ' ইত্যাদি শব্দের আধিক্য তার গদ্যভাবনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। এই জাতীয় শব্দগুলি তাদের প্রচলিত অর্থকে ছাপিয়ে বাক্যে বিশেষ মাত্রা সংযোজন করত। বস্তুত আবেগ প্রবণ লেখক ছিলেন তিনি। আবেগ বা বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করতে তিনি এ জাতীয় শব্দের বহুল ব্যবহার করেছেনয বাক্যের গঠন প্রকৃতি এ সমস্ত শব্দের সংস্পর্শে প্রাণময় হয়ে উঠত তাই।

বাক্যের প্রারম্ভে এমনই পাই—*'কিন্তু এই লজ্জার প্রকাশটাকে যে তৎক্ষণাৎ দমন করিয়া ফেলিল'*[৫৫] আবার পাই—*'কিন্তু যাক সে কথা'*[৫৬] অন্যত্র আরও পাই—*'কিন্তু আশ্চর্য, এতবড় তিরস্কারেও বিজয়া বিচলিত হইল না।'*[৫৭] এছাড়া অন্য অব্যয় পদ পাই—*'সে যাই হোক বল ত শ্রীকান্ত এ দুঃখ কত বড়?'*[৫৮]

আবার পাই—*'অতএব এ সকলও থাক্'*[৫৯] আরও পাওয়া যায়—*'স্বামী হেসে বললেন বটে। কিন্তু তাই যদি হয় অতবড় মিথ্যে কথাটা কাল কি করে মুখে আনলে বল ত?'*[৬০]

আরও পাওয়া যায় *'অন্তর্যামী ত জানেন যথার্থ পাপ সে করে নাই'*[৬১]—সর্বত্র অব্যয়পদের ব্যঞ্জনাময় সুপ্রয়োগ বাক্য তথা ভাবনাকে জীবনরসে সঞ্জীবিত করেছে। ভাষা-ভাবনা মাটির পৃথিবীর ধূলিমলিন জীবনরসে জারিত হয়েছে—যা কথাশিল্পীর জনপ্রিয়তা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে।

প্রশ্নবোধক ও ভাবপ্রকাশক বাক্যে যতি-চিহ্নের ব্যবহার বাক্যগঠনকে আশ্চর্য প্রাণময়তা দিত শরৎচন্দ্রের গদ্যভাবনায়। বিশেষত ড্যাসের ব্যবহার, অসমাপ্ত উক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠকচিত্তকে কৌতূহলী করে তুলতেন শিল্পী। কোথাও চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশিত করেছেন অসমাপ্ত উক্তিতে ড্যাসের পর্যাপ্ত ব্যবহারে —'বড়দিদি' উপন্যাসে শান্তির মনোবাঞ্ছা এভাবেই উপস্থাপিত —*'শান্তি ক্রমাগত চক্ষু মুছিতে লাগিল—মা দুর্গা! জোড়া মোষ দেব—যা চাও তাই দেব—তাঁকে ফিরিয়ে দাও—বুক চিরে রক্ত দেব—যত চাও — হে মা দুর্গা যত চাও—যতক্ষণ না তোমার পিপাসা মিটে।'*[৬২] পতির প্রতি স্ত্রীর প্রেম-নিষ্ঠ ঈশ্বরের কাছে নতজানু প্রতিজ্ঞায় উচ্ছ্বসিত হয়েছে। অসম্পূর্ণ বাক্য সেই হৃদয়-বাসনাকেই তুলে ধরেছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বে এরকমই অসমাপ্ত বাক্য ড্যাস-চিহ্নের প্রয়োগে বর্ণময় হয়েছে। *'ইন্দ্র একবার আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, না—তবে কি? দাঁড়িয়ে মার খাবি নাকি? ঐ ওই দিক থেকে ওরা আসছে—আচ্ছা তবে খুব কষে দৌড়ো'*[৬৩]—অসহায় অপরিচিতের প্রতি সহমর্মী ইন্দ্রনাথের মানবিকবোধ অসম্পূর্ণ বাক্যাংশে ড্যাসের ব্যবহারে উদ্ভাসিত হয়েছে।

অন্যত্র এই ইন্দ্রনাথ চরিত্রের অসাধারণত্ব মৃত শিশুদেহ দেখে জাত-ধর্ম-নির্বিশেষে করুণ মমতায় উদ্বেলিত হয়েছে এ ভাবে—*'এই যেমন আমাদের ডিঙিটা—এর কি জাত আছে? আমগাছ, জামগাছ যে কাঠেরই তৈরি হোক—এখন ডিঙি ছাড়া একে কেউ বলবে না—আমগাছ, জামগাছ — বুঝলি না?'*[৬৪] —গভীর জীবনবোধ তথা সত্যের উপলব্ধি সহজ ভাষায় অসম্পূর্ণ বাক্যাংশে ড্যাসচিহ্নের ব্যবহারে রচিত হয়ে সামান্য এক কিশোর চরিত্রকে অসামান্য করে তোলে।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসে উপন্যাসে পাই—*'তাহার নিভৃত অন্তরবাসী তাহার সমস্ত চক্ষু-কর্ণ দৃঢ়রুদ্ধ করিয়া এখনও এক বিশ্বাসে অটল হইয়া আছে—সে শুধু আমারই আমার বড় আর তাহার কিছুই নাই—যাহাকে কোন প্রতিকূল সাক্ষ্য এমনকি সাবিত্রীর বিরুদ্ধে তাহার নিজের মুখের কথাও তিলার্ধ বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই—তাহা হইলে হয়ত সতীশ এই পরমাশ্চর্যের অর্থ বুঝিতে পারিত।'*[৬৫] —সতীশ চরিত্রের হৃদয়ের নিগূঢ়তম উপলব্ধি অসম্পূর্ণ বাক্যগঠনে 'ড্যাসের' ব্যবহারে ধরা পড়েছে। সাবিত্রীর প্রতি তীব্র অপ্রতিরোধ্য প্রেম বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে পাই —*'অচলা যে তোমাকে কত ভালবাসত, সে আমিও বুঝিনি, তুমিও বোঝনি — ও নিজেও বুঝতে পারেনি। সেটা তোমার দারিদ্র্যের সঙ্গে এমনি খুলিয়ে উঠল যে — যাক! এমন সুন্দর জিনিসটি মাটি করে ফেললুম — না পেলুম নিজে, না পেতে দিলুম অপরকে।'*[৬৬] —মৃত্যুপথ যাত্রী সুরেশের তীব্র অন্তর্দাহ, গ্লানিময় স্বীকারোক্তি এখানে অসম্পূর্ণ বাক্যাংশে উচ্চারিত হয়েছে। অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার হৃদয়মথিত দীর্ঘশ্বাস ও মুখে উচ্চারিত অসম্পূর্ণ বাক্যাংশ সমার্থক হয়ে উঠেছে। 'ড্যাস' 'যতি' চিহ্নটি সার্থক ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে বাক্য।

শরৎচন্দ্র বাক্যে ভাবপ্রকাশ করতে 'বিস্ময়সূচক' চিহ্নের প্রতি বিশেষ প্রীতি দেখিয়েছেন। ভাবাবেগময় পরিবেশ 'বিস্ময়বোধক' চিহ্নের ব্যবহারে যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে। 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসে বিরাজের অতল অসীম দুঃখের দহন লেখক 'বিস্ময় সূচক চিহ্নের' মাধ্যমে তুলে ধরেছেন —*'শান্ত নির্বাক ধরিত্রীর অন্তরালে কি আগুন জ্বলে, সে বুঝিবার ক্ষমতা তুই কোথায় পাইবি!'*[৬৭]

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে কুসুমের একান্ত অন্তরের কথা বিস্ময়সূচক বাক্যে আশ্চর্য অভিব্যক্তি পেয়েছে—*'কেন এ কি আমার নিজে হাতে গড়া সম্বন্ধ যে আমি মানা করিলেই তাহা উড়িয়া যাইবে!*'[৬৮]

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে গ্রাম্য জীবনের পরশ্রীকাতর নীচতা দেখে বিস্মিত রমেশ ভেবেছে—*'হায়রে! এ কি ভয়ানক ভ্রান্তি! তাহার শহরের মধ্যেও যে এমন বিরোধ, এই পরশ্রীকাতরতা চোখে পড়ে নাই।*'[৬৯]

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে ইন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রীকান্তের ভাবনা বাক্যে এভাবে এই বিশেষ চিহ্নের সুপ্রয়োগে ব্যঞ্জিত হয়েছে—*'এ ত শুধু খেলা নয়! জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থত্যাগ এই বয়সে কয়টা লোক করিয়াছে।*'[৭০] 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলার ভ্রান্তিময় জীবনের কদর্য গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা তার কণ্ঠে করুণ মিনতিতে ফেটে পড়তে চেয়েছে —*'হে ঈশ্বর! আমি আর পারিনে—আমাকে তুমি নাও! কিন্তু তিনি ও শুনলেন না, তুমিও শুনতে চাও না। আমি আর কি করব!*'[৭১]—বিস্ময়বোধক চিহ্নের বারবার প্রয়োগে বাক্য আবেদনময় হয়েছে। নারী চরিত্রটির জীবনের করুণ অসাহায়তা ভাষায় বেদনাময় হয়েছে।

'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে সন্ধ্যার কণ্ঠে ভয়ঙ্কর সত্য উচ্চারিত হয়। অরুণের কাছে সে সোচ্চার ভেঙে পড়ে এ ভাবে—*'ওগো! এ সত্যি, এ সত্যি, এ ভয়ঙ্কর সত্যি! সত্যিই আমাদের তোমরা যা বলে জানতে তা আমি নই। তোমার সন্ধ্যা বামুনের মেয়ে নয়।*'[৭২] —প্রকৃত সত্যের উপলব্ধিজাত বেদনাময় বিস্ময় বাক্যগঠনে বিস্ময়সূচক চিহ্নের বারবার প্রয়োগে প্রকাশিত। যতিচিহ্নটির প্রয়োগ বাক্যটিকে নাটকীয় করে তুলেছে।

শরৎচন্দ্র বাক্যনির্মাণে বিশেষ কতগুলি শব্দ ব্যবহার করতেন বেশী। 'নিরতিশয়' 'অন্তর্যামী' ইত্যাদি শব্দের বারবার ব্যবহার তাঁর আবেগ ব্যাকুল হৃদয়কে উদ্ঘাটিত করেথে। 'দেবদাস' উপন্যাসে পার্বতীর সঙ্গে দেবদাসের সামাজিক পদ্ধতিতে বিবাহের বাধাকে মেনে নিয়ে পার্বতীর উদ্দেশ্যে দেবদাস যে পত্র লিখেছে তাতে তার মনের কথা স্পষ্ট হয়েছে —*'তোমার জন্য আমার অন্তরের মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশ বোধ করিতেছি না।*'[৭৩] —'নিরতিশয়' 'তৎসম'—এই বিশেষ শব্দটি বিশেষণ রূপে বাক্যে প্রযুক্ত হয়ে বাক্যটিকে তাৎপর্যময় করে তুলেছে। আবার অন্যত্র এই উপন্যাসে পাই —*'আর একখানি স্নেহকোমল মুখ আজ জীবনের শেষক্ষণে নিরতিশয় পবিত্র হইয়া*

দেখা দিল"[৭৪]—সংসারের দৃষ্টিতে অসতী - চন্দ্রমুখীর দেবদাসের হৃদয়ে দেবীতে পর্যবসিত হওয়ার প্রসঙ্গ 'নিরতিশয়' বিশেষণ হিসাবে ব্যবহারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে অভয়ার স্বামীর নির্দয় নির্মমতা ও তার অমানবিক ব্যবহার, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচাকে প্রকাশিত হয়েছে। সেই ঘৃণ্য মানুষটির প্রসঙ্গটি লেখক উত্থাপিত করেচেন এই বিশেষ শব্দটির প্রয়োগে। বাক্যটি হল এই—*'সেই নিরতিশয় হীন অমানুষ বর্বরটার বিরুদ্ধে আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা পুনরায় আলোড়িত হইয়া উঠিল।'*"[৭৫]

'অন্তর্যামী' শব্দটির প্রয়োগ বাক্যকে ভাবাবেগময় ব্যাকুল করেছে। এ ভাবেই 'বড়দিদি' উপন্যাসে সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী শান্তির কণ্ঠে —*'কেন কাঁদি। অন্তর্যামী জানেন। তাও বুঝতে পারি যে তুমি অযত্ন কর না।'*"[৭৬]—আবার অন্যত্র বিরাজ বৌ উপন্যাসে বিরাজের স্বামীর প্রতি তীব্র শ্রদ্ধাজনিত অনুরাগে অন্তর্যামী ঈশ্বরের কাছে প্রকাশিত হয়েছে এ ভাষায় —*'অন্তর্যামী ঠাকুর, একটিবার মুখ তুলে চাও। যে লোক কোন দোষ, কোন পাপ করতে জানে না তাকে আর কষ্ট দিও না ঠাকুর, —আর আমি সইতে পারব না।'*"[৭৭]

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে ভাগ্য বিড়ম্বিতা কুসুমের স্বামী-পুত্র সংসারের প্রতি তীব্র আসক্তি ঈশ্বরের প্রতি অভিযোগ ফেটে পড়েছে। তাঁর নারী হৃদয়ের অভিমান অন্তর্যামীশব্দ প্রয়োগে ব্যঞ্জনাময় হয়েছে। বাক্যটি হল এহ—*'আমার অন্তর্যামী যাহাদিগকে স্বামী-পুত্র বলিয়া চিনিয়াছে, সমস্ত জগতের সুমুখে সে কথা সপ্রমাণ করিবার রেখামাত্র পথ অবশিষ্ট রাখ নাই কেন?'*"[৭৮]

শরৎচন্দ্র বাক্যগঠনে শব্দচয়নের বিষয়ে স্পর্শকাতর ছিলেন না। ভাবকে যথাযথ প্রকাশ করার জন্য সমস্ত রকমের শব্দই তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করতেন। জীবনের সঙ্গে জড়িত যে-কোন শব্দই তাঁর সাহিত্য প্রাঙ্গনে প্রবেশাধিকার পেত।

'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসে কুঞ্জের স্ত্রী ব্রজেশ্বরীর মা কুসুমকে উদ্দেশ্য করে যে ভাষা বলেছে সেটি হল—*'ওলো ও যেমন করে বার হতে জানে তা দেখলে আমাদের বুড়ো মাগীদের পর্যন্ত লজ্জা হয়'*"[৭৯]—'ওলো' সম্বোধন পদটি ও 'মাগী' এই নিতান্ত তুচ্ছার্থক গ্রাম্য শব্দটি অনায়াসে নির্বাচিত হয়েছে তাঁর রচনায় বাক্যে ঘটেছে যা পাঠককে বিস্মিত করে। শ্রীকান্ত উপন্যাসে ব্রহ্মদেশে জনৈক বাঙালী এক ব্যক্তির কণ্ঠে ধ্বনিত ভাষার শব্দটি আমাদের আকর্ষণ করে। অপরিচিত মানুষটি বলে —*'ওঃ মিস্তিরী। অমন সবাই নিজেকে মিস্তিরী কবলায় মশায়।'*"[৮০] —স্বীকৃতি অর্থে 'কবলায়' শব্দের

বিশেষ প্রয়োগ বাক্যটির মধ্যে চমক আনে।

শব্দালংকার ও অর্থলংকার ব্যবহার বাক্যের গঠনকে উজ্জ্বলকে করে তোলে। বাক্য উপযুক্ত 'অলংকার' প্রয়োগে বর্ণময় আভাযুক্ত হয়। ভাষাশিল্প গড়ে ওঠে শব্দ, বাক্য, বাক্যের বিন্যাস, যতি, অনুচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ অধ্যায় ও অলংকরণ সহযোগে। শরৎচন্দ্রের ভাষা খুব বেশী অলঙ্কৃত নয় তবে অলঙ্কার তিনি নানা স্থানে ব্যবহার করেছেন এবং মাঝে মাঝে তাঁর লেখায় উচ্চশ্রেণির অলঙ্কার সমাবেশ দেখা যায়। উপমা, রূপক, বক্রোক্তি, অনুপ্রাস ইত্যাদি অর্থালংকার এবং শব্দালংকার তাঁর বাক্য নির্মিতিতে প্রযুক্ত হয়েছে—সেটি তাঁর বক্তব্যকে প্রাণময় ও গতিশীল করে তুলেছে। শব্দালংকারের শ্রেষ্ঠত্ব অনুপ্রাসেই সূচিত হয়। শরৎচন্দ্র বাক্যভাবনায় অনুপ্রাসের সৃষ্টি করতেন সার্থকভাবে যেটি গদ্যে ছন্দোস্পন্দন ঘটাত। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রাত্রির বর্ণনা বাক্যে অনুপ্রাসে এমন ভাবেই ঝংকৃত হয়েছে —*'বায়ু লেশহীন নিষ্কম্প নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি'*[৮১]—রাত্রির ভয়ংকর সৌন্দর্য 'ন' ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহারে উদ্ভাসিত হয়েছে। গঙ্গার ভীষণ রূপ অন্ধকারের প্রেক্ষিতে বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের বারবার প্রয়োগে অনুপ্রাসের সৃষ্টি করেছে এ ভাবেই—*'আশে পাশে সম্মুখে কোথাও বা উন্মত্ত জলস্রোত গভীর তলদেশে ঘা খাইয়া উপরে উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা প্রতিকূল গতি পরস্পরের সংঘাতে আবর্ত রচিয়া পাক খাইতেছে'*[৮২] — অনুপ্রাসের মতই অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বারবার ব্যবহৃত হয়ে জলধারার আবর্ত সৃষ্টি করেছে বাক্যে তারই অনুরণন শোনা যায়। 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বর্ণনায় পাই অনুপ্রাসের আশ্চর্য স্পন্দন—*'কিন্তু সমুদ্র জলে ধাক্কা দিলে যাহা জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে, সেই জ্বলা নানাপ্রকারের বিচিত্র রেখায় ইহার মাথার উপর খেলা করিতে না থাকিলে এই গভীরকৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব এই অন্ধকারে হয়ত তেমন করিয়া দেখিতেই পাইতাম না।'*[৮৩] — 'জ'-এর বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ জলধারাকে বর্ণোজ্জ্বল করে তুলেছে। গদ্যভাষায় বাক্যে ছন্দের অনুরণন ঘটেছে।

এই উপন্যাসের অন্যত্র পাই —*'কিন্তু ব্যথা একজন সহিতে স্বীকার করিলেই কিন্তু ব্যথা দেওয়ার কাজটা সহজ হইয়া উঠেনা।'*[৮৪] — 'ব্যথা' শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত হয়ে ভাষাকে মরমি করে তুলেছে এবং যেন যন্ত্রণা দগ্ধ হৃদয়ের সত্যকে তুলে ধরেছে। অনুপ্রাসের সংবেদনময়তায় বাক্যটি নিবিড় হয়ে উঠেছে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলা ও সুরেশের ঘৃণ্য উন্মাদনাময় প্রেমের বর্ণনায় ভাষা অনুপ্রাসের সুরে বেজে উঠেছে —*'নিমেষ না গত হইতেই আবার বোধ হইতে লাগিল এই উন্মত্ত নির্লজ্জতার বুঝি* সীমা নাই, শেষ নাই, সর্বদিক সর্বকাল ব্যাপিয়া হইয়া রহিবে।'[৮৫] — এই উন্মত্ত প্রেমভাবনাটি যেমন তারই সার্থক প্রতিবিম্বন অনুপ্রাসের মতো পুনরাবৃত্তিতে ভেসেছে।

আবার অন্যত্র এই উপন্যাসে পাই—*'বাহিরের মত্ত প্রকৃতি তেমনি মাতলামি করিতে লাগিল, প্রগাঢ় অন্ধকারে বিদ্যুৎ তেমনি হাসিয়া হাসিয়া উঠিতে লাগিল'*[৮৬]—অসমাপিকা ক্রিয়ার 'হাসিয়া'র পুনরাবৃত্তি ও উঠিতে লাগিল ও করিতে লাগিল—যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ বক্তব্যকে সঙ্গীতের মত আবেদনময় করে তুলেছে। শব্দ প্রয়োগের সুসামঞ্জস্য ভাষায় সুর মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করেছে। বিহ্বল চিত্তের প্রতিফলন সার্থক ভাবে শরৎচন্দ্র শব্দালংকারের পাশাপাশি উপমা, রূপক-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তির উদ্ভবনেও বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। অর্থালংকার শরৎচন্দ্রের গদ্যভাষাকে ব্যঞ্জনাময় দীপ্তি দান করত। উপমা-অলংকার প্রয়োগে তিনি অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন। অনেক বর্ণনায় একাধিক উপমা সুশৃঙ্খল ভাবে তিনি প্রয়োগ করেছেন। উপমা অলংকারের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়ে বাক্য গঠনরীতিতে সৌন্দর্য সঞ্চার করেছেন শিল্পী যা শিল্পীর কবি-ভাবনাকে চিত্রময় করে তুলত।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্তকেন্দ্রিক রাজলক্ষ্মীর প্রেমানুভবের গভীরতাকে উপলব্ধি করে তার বিস্মিত মনের প্রতিফলন বাক্যে বর্ণিত হয়—*'ভাটার নদীতে আবার জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের শব্দ মোহনার কাছে শুনা যাইতেছে'*[৮৭]—প্রেমের অতলান্ত গভীর রহস্যময়তা নদীর জোয়ার ভাটার সঙ্গে উপমিত হয়ে হৃদয়ের অস্ফুট অনুভবকে তুলে ধরেছে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরেশের মৃত্যুর পর অচলার অনুভবশূণ্য অবস্থাকে লেখক এ ভাবেই বর্ণনা করেছেন—*'যতদূর দেখা যায় ভবিষ্যতের আকাশ শুধু ধু ধু করিতেছে। তাহার রঙ নাই—মূর্তি নাই, গতি নাই, প্রকৃতি নাই —একেবারে নির্বিকার, একেবারে একান্ত শূণ্য'*[৮৮]— অচলার রিক্ত হৃদয় ধূসর বিবর্ণ আকাশের সঙ্গে উপমিত হয়ে জীবনের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি বোধের মূল্যায়ন করেছে। বাক্য চরিত্রটির আত্মপর্যালোচনা করেছে।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসে কিরণময়ী চরিত্রের রূপের ঐন্দ্রজালিক শক্তির সামর্থ্যকে লেখক বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—*'কাঁচপোকা যেমন করিয়া পতঙ্গকে টানিয়া আনে তেমনি করিয়া দুর্নিবার যাদুমন্ত্রে কিরণময়ী অর্ধসচেতন বিমূঢ়-চিত্ত হতভাগ্য দিবাকরকে জাহাজ ঘাটে টানিয়া আনিয়া*

উপস্থিত করিল।[৯৯] কিরণময়ীর রূপের চুম্বক শক্তি কাঁচপোকার পতঙ্গটানার সঙ্গে উপমিত হয়েছে। অর্থালংকারের প্রয়োগ বাক্যে আবেদনময়তা এনেছে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলাকে মহিমের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে সুরেশ। এই অবৈধ অনৈতিক প্রেমের দায়ভার সম্পূর্ণই সে অচলার উপর চাপিয়ে দিয়েছে। তীব্র ঘৃণ্য ভাষায় অভিযোগ ও তিরস্কারেও সে পিছপা হয়নি। স্বামী-হারা-কুল-হারা অচলার অসহায় ও আর্ত বিদীর্ণ হৃদয় সুরেশ উপভোগ করতে চেয়েছে। তার তৎকালীন মানসিক অবস্থাকে লেখক এই ভাবে বাক্যে উপমিত করেছেন—*'নতুন শিকারী তাহার প্রথম ভূপতিত পক্ষিনীর মৃত্যুযন্ত্রণা যেমন অবাক হইয়া চাহিয়া দেখে তেমনি দুই মুগ্ধ চক্ষের অপলক দৃষ্টি দিয়া সে যেন কোন এক মরণাহত নারীর শেষ মুহূর্তের সাক্ষ্য লইতে দাঁড়াইয়া রহিল'*[১০০] —শিকারীর পক্ষীশিকার ও সুরেশ কর্তৃক অচলার হেনস্থা একই সঙ্গে বিবৃতিতে উপমিত হয়েছে।

আবার 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে দিবাকরকে কেন্দ্র করে ঘৃণ্য নিষিদ্ধ ভালবাসার খেলায় উদ্যত কিরণময়ীকে দিবাকর প্রতিহত করতে চাইলে কিরণময়ীর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে লেখক আহত ব্যাঘ্রীর সঙ্গে উপমিত করেছেন—*'দুই চক্ষু তাহার বাণবিদ্ধ ব্যাঘ্রীর মত জ্বলিয়া উঠিল।'*[১০১] বাক্যটি উপমা অলংকারের প্রয়োগেতীব্রতম হয়ে উঠেছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে টগর বোষ্টমী ও নন্দমিস্ত্রীর সম্পর্কের স্থায়িত্বকে লেখক উপমিত করেছেন এভাবেই বাক্যে—*'নাহয় যৌবনের মত নন্দমিস্ত্রীও একদিন অজ্ঞাতসারে খসিয়া পড়িবে।'*[১০২]

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের অভয়ার স্বামীর কদর্য বুনোভঙ্গিটিকে মোষের সঙ্গে উপমিত করেছেন শিল্পী—*'এই মহিষটা যে বর্মার কোন গভীর জঙ্গল হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিল'*[১০৩]—ভাষা উপমা-সংলগ্ন হয়ে ছবিতে পরিণত হয়েছে। বাক্য যেন চিত্রল হয়েছে সার্থক অলংকার প্রয়োগে।

প্রকৃতিজগৎ অনেকক্ষেত্রে মানব মানবীর আচরণের সঙ্গে উপমিত হয়ে গদ্যকে কাব্যে পরিণত করেছে। শ্রীকান্ত উপন্যাসে অন্নদাদিদির হাসি বর্ণিত হয়েছে এভাবে—*'সে যেন নিবিড় মেঘভরা আকাশের বিদ্যুৎদীপ্তির মত'*[১০৪] —এ গদ্যে ছন্দের স্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়। বাক্য কবিতায় পরিণত হয়েছে।

এই উপন্যাসেই পিয়ারী বাঈজীর হাসির উল্লেখ পাই এভাবে – 'শরতের মেঘলা জ্যোৎস্নার মত একটা সহজ হাসির আভা দেখা দিল।[৯৫]'

'বিরাজ বৌ' উপন্যাসে দুঃখে দারিদ্র্যে ও প্রিয়তমা স্বামী কর্তৃক অবহেলায় বিরাজের অনিন্দ্যকান্তি রূপ যে ক্রমেই মলিন হয়ে পড়েছে সেটি লেখক প্রকৃতি জগতের সঙ্গে উপমিত করে গদ্যভাষায় বাক্যগঠনে ব্যঞ্জিত করেছেন – "ভাঁটার টানে জল যেমন প্রতি মুহূর্তে ক্ষয়চিহ্ন তটপ্রান্তে আঁকিতে আঁকিতে দূর হইতে সুদূরে সরিয়া যায় ঠিক তেমন করিয়া বিরাজ শুকাইতে লাগিল। [৯৬]"

কোথাও বা প্রত্যাহিক জীবনের প্রসঙ্গ উপমিত হয়ে বাক্যকে রূপময় করে তুলেছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জাহাজের দুলুনি বর্ণনা করেছেন – 'মেয়েরা শিলের উপর পোড়া দিয়া যেমন করিয়া বাটনা বাটে, কল্যকার সাইক্লোন এই তিন চারশ লোক দিয়া ঠিক তেমনি করিয়া সারারাত্রি বাটনা বাটিয়াছে।'[৯৭] – মেয়েদের শিলপোড়া দিয়ে বাটনা বাটার সঙ্গে সইক্লোনের প্রেক্ষিতে যাত্রীসহ জাহাজের দুলুনি উপমিত হয়ে ঘরোয়া জীবনের স্পর্শ দিয়েছে। শিল্পী উপমা সংগ্রহের জন্য বাইরের বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ পৃথিবীর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন। যা তাঁর গদ্যভাবনাকে বস্তুসংলগ্ন করেছে।

শরৎচন্দ্র বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের অভিন্নতাকে উপলব্ধি করেছিলেন। নিসর্গ প্রকৃতির মধ্যে মানবহৃদয়ের গভীরতম বেদনার প্রতিচ্ছবি তিনি দেখতে পেয়েছেন। তাই নিসর্গজগৎ তাঁর গদ্যভাবনায় অনেকটাই অংশ জুড়ে আছে যাকে তিনি মানবোচিত ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছিলেন বাক্যে। সমাসোক্তি অলংকারের ব্যবহার বাক্যের গঠনে ব্যঞ্জনাময় মাত্রা দিয়েছিল, যা পাঠকমনকে মুগ্ধ করে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে পিয়ারী বাঈজীর বুকফাটা কান্না গভীর অন্ধকার রাত্রি তৃপ্তির সঙ্গে যেন দেখেছে। নিশীথ রজনীর সেই বিস্ময় বাক্যে বর্ণিত হয়েছে এ ভাবে – 'একবার শুধু মনে হইল জানালার বাহিরে অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয় সহচারী বাঈজীর বুকফাটা অভিনয় যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছে।'[৯৮]

অন্যত্র এই সমাসোক্তি অলংকারের প্রয়োগ বাক্যে উজ্জ্বলতা দান করেছে এভাবে – 'অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবীজোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিতচক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর মুখ বুজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা

করিতেছে'। [৯৯]—গভীর রাত্রির তপস্বিনীর রূপ বর্ণনাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলেছে। 'রাত্রি' যেন নারীতে পরিণত হয়েছে।

উপমা-রূপক-সমাসোক্তি-ইত্যাদি অলংকার তথা অর্থালংকারের যথাযথ সৃজনে শরৎচন্দ্রের গদ্যভাষার বাক্যছাঁদ বৈচিত্রময় হয়েছিল। প্রকৃত অলংকার ভাবের অঙ্গ স্বরূপ ও ভাবপ্রকাশের সার্থক যে বাহক-সেটি শরৎচন্দ্রের গদ্যে সার্থক ভাবে প্রমাণিত।

এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক অবন্তীকুমার সান্যাল তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি' গ্রন্থে লিখেছেন—*'ভাববস্তুর প্রকাশের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে সম্পর্কিত না-হলে অলংকরণ অসার্থক, অলংকার সৌন্দর্যহীন। অলংকারকে ব্যাপক ও সংকীর্ণ কাব্যের নিত্য অথবা অনিত্য ধর্ম—যে অর্থেই গ্রহণ করা হোক, তা যে অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য এবং এক প্রযত্ন তাতে বিতর্কের তিলমাত্র অবকাশ নেই। প্রকৃত অলংকার সর্বক্ষেত্রেই প্রকাশিত ভাবের অঙ্গ, অলংকরণ ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন।'*[১০০]

পরিশেষে একথাই বলা যায় শরৎচন্দ্রের গদ্যভাবনায় বাক্যগঠন, বাক্যের অন্বয়, শব্দসংস্থান, অত্যন্ত যথাযথ। সহজ পরিচিত জীবনসংশ্লিষ্ট শব্দচয়নে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন যার ব্যবহার গুণ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। সরল-যৌগিক-জটিল বাক্যবন্ধে তার ভাবনা বিবৃত হয়ে গদ্যভাষাকে প্রবহমানতা দিয়েছিল। সুবিন্যস্ত গতিচাল ও সুষম তালে হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যপরম্পরায় তাঁর ভাষারীতি আশ্চর্য কবিত্বময় চিত্রধর্মিতা সৃষ্টি করেছিল। উপমা-রূপক-সমাসোক্তি ইত্যাদি অর্থালংকারের প্রাচুর্যে সেই রূপ আরও বিলসিত হয়ে উঠেছিল, মহৎ বাণী হয়ে উঠেছিল মহত্তম।

এ বাক্যগঠনের বিশেষত্ব এর সহজ স্বতস্ফূর্ত মৌলিকতায় আধুনিক কালের পাঠকও আবিষ্ট। একে এড়ানোর সাধ্য এই নবযুগেরও অসাধ্য বলা চলে। শরৎ গদ্যভাবনার অনায়াস স্বচ্ছন্দতায় সাধারণ অর্থ হয়ে উঠেছিল অনন্য সাধারণ এভাষার আন্তরিক শক্তির এটিই বিশেষ মূলধন বলতে পারি। শরৎ-পরবর্তী কথাশিল্পী যথা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় বাক্যভাবনার বিশেষত্ব তাদের বিষয়গত অভিনবত্বের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে মানবের যে চিরন্তন পথিকবৃত্তি — নিরন্তর পথ চলার যে ক্লান্তিহীন আকাঙ্ক্ষা তা ভাষায় বাক্যগঠনে আশ্চর্য সুন্দর ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে এ ভাষায়—*'পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন — মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি*

তোমাদের গ্রামে বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাবে বীরু রায়ের বটতলায়, কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়। তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়য়ে, ইছামতি পার হয়ে পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে পাড়ি দিয়ে পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে শুধুই সামনে, দেশ ছাড়িয়ে দেশান্তরের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে।'[১০১] — এ ভাষার বাক্যবন্ধে গতির ছন্দ মন্দ্রিত। ক্রিয়াপদের একাধিক ব্যবহার বিশেষত অসমাপিকা ক্রিয়াপদে বাক্যাংশে গ্রথিত হয়ে অন্তহীন পথ-পরিক্রমার 'চরৈবেতি' মন্ত্রকে ধ্বনিত করেছে। খণ্ড বাক্যাংশগুলি যেন চলার প্রবাহে তরঙ্গ তুলেছে।

তাহলে আলোচনাসূত্রে একথা বলাই যায় যে, উপন্যাসের ভাষা আলোচনায় বাক্যগঠনের প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ-সরণি বেয়ে বাংলা উপন্যাসের বাক্য ব্যবহার বিবিধ সাহিত্যেকের মনোধর্ম অনুসারে ক্রমেই নতুন থেকে নতুনতর হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষাভাবনার বাক্যগঠনের মৌলিকতা পরবর্তী প্রজন্মকে মৌলিকতর হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। মাটির তাল নিয়ে চাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কুমোরের গড়ে তোলা হাঁড়িকুড়ি খেলনার মত উপন্যাসিক মানুষের মনের ঝোঁক হৃদয়ের আবেগকে বাক্যে নব নব ভাবে আকার দিয়ে চলেছেন ক্রমাগতই। বর্তমান উপন্যাস সমূহের পাতায় পাতায় তারই রূপময় প্রকাশ।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সান্যাল অবন্তীকুমার, রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি ; ২০৬ বিধান সরণি; কলিকাতা - ৬; সারস্বত লাইব্রেরী; প্রথম প্রকাশ ১৩৭৬; পৃ. ১১৮।

২. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণকান্তের উইল; বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড; কলিকাতা - ৯; সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড ১৩৬০; নবম সংস্করণ ১৩৮৭; পৃ. ৫৪২।

৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, বাংলা ভাষা পরিচয়; রবীন্দ্র রচনাবলী; ৬, আচার্য জগদীশ বসু রোড; কলিকাতা - ১৭; বিশ্বভারতী; ১৪০২ সংস্করণ; ত্রয়োদশ খণ্ড; পৃ. ৫৮১।

৪. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চোখের বালি; রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড); ৬, আচার্য জগদীশ বসু রোড; কলিকাতা - ১৭; বিশ্বভারতী; ১৪০২ সংস্করণ; পৃ. ৪৬৪।

৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চতুরঙ্গ; রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড); ৬, আচার্য জগদীশ বসু রোড; কলিকাতা - ১৭; বিশ্বভারতী; ১৪০২ সংস্করণ; পৃ. ৪৬১।

৬. লাহিড়ী ড. কার্তিক, উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি; ২০৬ বিধান সরণি; কলিকাতা - ৬; সারস্বত লাইব্রেরী; প্রথম প্রকাশ ১৩৭৯; পৃ. ২৪৬।

৭. মজুমদার মোহিতলাল, উৎস : শরৎচেতনা; শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, এ মুখার্জী এণ্ড কোং. প্রা. লি.; ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ১২; প্রথম প্রকাশ ১৩৭৪; পৃ. ৪৫৪।

৮. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, রাজসিংহ; বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড; কলকাতা - ৯; সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., প্রথম প্রকাশ ১৩৬০; নবম সংস্করণ ১৩৮৭; পৃ. ৬০৩।

৯. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বিষবৃক্ষ; বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ঐ; পৃ. ২৯০।

১০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বড়দিদি; শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১; আঃ পাঃ লিঃ ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন; কলিকাতা - ৯; প্রথম প্রকাশ ১৩৯৩; পৃ. ২২।

১১. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বিরাজ বৌ; শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১; আঃ পাঃ লিঃ ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা - ৯; পৃ. ৫৫।

১২. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, দেবদাস; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; আ. পা. লি. ঐ; পৃ. ৫৬৮।

১৩. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; আ. পা. লি. ঐ; পৃ. ২৯৫।

১৪. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, অভাগীর স্বর্গ; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ২৯৫।

১৫. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বিলাসী; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -২; ঐ; পৃ. ১৭১৩।

১৬. সেনগুপ্ত সুবোধচন্দ্র, শরৎচন্দ্র; এ মুখার্জী এণ্ড কোং, ২, বঙ্কিম চাট্যার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ১২, একাদশ সংস্করণ, ১৩৮১, পৃ. ১৮১।

১৭. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত; (প্রথম পর্ব), শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ২৬৮।

১৮. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৯৭৭।

১৯. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ২৭৯।

২০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ২৯১।

২১. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (তৃতীয় পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৪৪৬।

২২. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ২৮৪।

২৩. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পথের দাবী; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -২; ঐ; পৃ. ১২৫৮।

২৪. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ; শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১; ঐ; পৃ. ৯৪৮।

২৫. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, চরিত্রহীন; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৭৪২।

২৬. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৯৫৫।

২৭. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ২৬৯।
২৮. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ২৭৪।
২৯. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, চরিত্রহীন; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৬৭৮।
৩০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পথের দাবী; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -২; ঐ; পৃ. ১১৪৪।
৩১. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, দেনাপাওনা; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ১০১৯।
৩২. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (চতুর্থ পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৪৮১।
৩৩. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৯৭৩।
৩৪. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, চরিত্রহীন; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৬৫৮।
৩৫. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পরিণীতা; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৮৭।
৩৬. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পরিণীতা; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৮৯।
৩৭. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৩১১।
৩৮. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (দ্বিতীয় পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৩৫৫।
৩৯. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, চরিত্রহীন; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৫১৯।
৪০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৯৩২।
৪১. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বিরাজবৌ; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৫৩।
৪২. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৯৭৬।
৪৩. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পথের দাবী; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -২; ঐ; পৃ. ১২৩৪।
৪৪. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ২৭৩।
৪৫. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ২৭৪।
৪৬. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (দ্বিতীয় পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৩২৫।
৪৭. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৯৪৮।
৪৮. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১; ঐ; পৃ. ২৭৬।
৪৯. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ২৭৯।
৫০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ২৭৫।
৫১. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ২৭৪।
৫২. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (দ্বিতীয় পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৩৩৭।
৫৩. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বড়দিদি; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ২২।

৮০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (দ্বিতীয় পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৩৪৪।

৫৪. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, অরক্ষণীয়া; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ২৫৮।

৫৫. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, চরিত্রহীন; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৬৮৭।

৫৬. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (দ্বিতীয় পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; পৃ. ৩২৫।

৫৭. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, দত্তা; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; পৃ. ৮৪৩।

৫৮. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); ঐ; পৃ. ২৯২।

৫৯. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); ঐ; পৃ. ২৫৮।

৬০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, স্বামী; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; পৃ. ৭৬৯।

৬১. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বিরাজবৌ; ঐ; পৃ. ৬২।

৬২. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বড়দিদি; ঐ; পৃ. ২১।

৬৩. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); ঐ; পৃ. ২৬৯।

৬৪. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); ঐ; পৃ. ২৭৯।

৬৫. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, চরিত্রহীন; ঐ; পৃ. ৩৬১।

৬৬. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ; ঐ; পৃ. ৯৭৪।

৬৭. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বিরাজবৌ; ঐ; পৃ. ৫২।

৬৮. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পণ্ডিতমশাই; ঐ; পৃ. ১০৮।

৬৯. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পল্লীসমাজ; ঐ; পৃ. ১৫৬।

৭০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); ঐ; পৃ. ২৭৫।

৭১. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ; ঐ; পৃ. ৯৭৬।

৭২. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বামুনের মেয়ে; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ১০১০।

৭৩. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, দেবদাস; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৫৩৭।

৭৪. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, দেবদাস; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৫৬৬।

৭৫. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (দ্বিতীয় পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৩৫৯।

৭৬. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বড়দিদি; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ১৫।

৭৭. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বিরাজবৌ; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৪০।

৭৮. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পণ্ডিতমশাই; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ১২২।

৭৯. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পণ্ডিতমশাই; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ১২৪।

৮০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (দ্বিতীয় পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৩৪৪।

৮১. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ২৭৩।
৮২. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ২৭৩।
৮৩. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (দ্বিতীয় পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৩৩৭।
৮৪. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১; ঐ; পৃ. ৩৮১।
৮৫. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৯৪৮।
৮৬. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ; শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১; ঐ; পৃ. ৯৫৫।
৮৭. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (দ্বিতীয় পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৩৬৯।
৮৮. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৯৭৬।
৮৯. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, চরিত্রহীন; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৭৩৩।
৯০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৯৩২।
৯১. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, চরিত্রহীন; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৭০৫।
৯২. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (দ্বিতীয় পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৩৫১।
৯৩. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (দ্বিতীয় পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৩৫১।
৯৪. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১; ঐ; পৃ. ২৮৬।
৯৫. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৩০৩।
৯৬. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বিরাজবৌ; শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৫২।
৯৭. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (দ্বিতীয় পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৩৩৭।
৯৮. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (দ্বিতীয় পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৩৩১।
৯৯. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব); শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১; ঐ; পৃ. ৩৩১।
১০০. সান্যাল অবন্তীকুমার, রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি; ২০৬, বিধান সরণি, কলিকাতা - ৬; সারস্বত লাইব্রেরী; প্রথম প্রকাশ ১৩৭৬; তৃতীয় মুদ্রণ ১৩৮৩; পৃ. ৯৪।
১০১. বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, পথের পাঁচালী; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা - ১২; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স; প্রথম প্রকাশ ১৩৭৯; পৃ. ৩৪৩।

****